

ইসলামপন্থা ও এক্য!

মুস্তফা হুসাইন

ইসলামের প্রভাব বিস্তার এবং শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশের বহু আলেম, তালেবে ইলম, দাঁই, সংগঠক বিচ্ছিন্নভাবে বা সাংগঠনিকভাবে নানামুখী মেহনত করে চলেছেন। আর যে কোনো আদর্শ, মানহাজ, চিন্তা বা দাওয়াহকে প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপক করতে সংগঠিত কর্মসূচি ও মেহনত অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয়। কিন্তু, অনেকের মাঝেই উন্মত্তের মাঝে বিভিন্ন সংগঠনকে ফিরকা আখ্যায়িত করার দুঃখজনক প্রবণতা বিদ্যমান। এটা ঠিক যে, ইসলামী সংগঠনগুলোর মাঝে জাহেলি সাম্প্রদায়িকতার উপস্থিতি নেই, এমনটা বলার সুযোগ নেই। কিন্তু, যে কোনো সুন্দর ও কার্যকর চিন্তাকে সংগঠিত হওয়া ব্যাতীত ফলাফল বের করার বিকল্পও মানবেতিহাসে নেই। পাশাপাশি, দুঃখজনকভাবে 'সংগঠন' নামক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণকে উদ্দেশ্যে পরিণত করার মতো আত্মাত্বা ও বিপজ্জনক মানসিকতা ও চর্চা বহু ইসলামী সংগঠন, মাদ্রাসা, খানকা বা মাসলাকের মাঝে মহামারীর ন্যায় ছড়িয়ে গেছে।

যার দরূণ, ইসলামপন্থীদের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করা এক বহুল প্রচলিত চিন্তা বা দুর্শিতা হচ্ছে,

"আগে এক্য প্রতিষ্ঠা না হলে, ফসল ঘরে তোলা যাবে না। তাই এক্য কায়েম করা জরুরী আগে।"

অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, এমন দাবীর কিছু সমস্যা ও সংকট রয়েছে। প্রথমত, সাধারণত এক্ষেত্রে এক্য বলতে ধরা হয়, 'একক নেতা বা জামাতের অধীনে সবার জমা হওয়া। সকলের জন্য সকল ক্ষেত্রেই একমুখী চিন্তায় নিবিষ্ট হওয়া।' এমনটা আসলে ভাবতে চাকচিক্যময় লাগলেও, তা আসলে বাস্তবতাবিবর্জিত। কেননা, এমন এক্য অর্জন সন্তুষ্ট হয় শক্তি ও সফলতার চরম স্তরে পৌছানোর পর। কেননা, অধিকাংশ মানুষ শক্তি, সফলতা ও বিজয়ের পরেই কেবল হকের পতাকাতলে একত্রিত হয়। আমাদের মতো দুর্বল ও নিপীড়িত মুসলিম সমাজে ঐক্যের এই ধারণাটি ঘোড়ার আগে গাড়ি লাগানোর মতো হয়ে যেতে পারে।

আসলে, আমাদের আকাংখিত জীবনই তো এটা যে, কেবলমাত্র আল্লাহ তা আলার জন্যই জাতি একত্রিত হবে, এবং ব্যক্তিগত ফায়দার দরূণ বিচ্ছিন্ন হবে না। আর এমন জীবন সাধারণত কেবল বিজয় ও কর্তৃত্বাভের পরেই অর্জিত হয়, আগে নয়। তাই সামগ্রিক ঐক্যকে ইসলামের কর্তৃত্ব পূর্বশর্ত সাব্যস্ত করা প্যারাডিগ্মাকাল ও বিপজ্জনক। বরং, প্রত্যেক ব্যক্তি বা সংগঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট আকিদা ও মানহাজকে কেন্দ্র করে সামর্থ্য মোতাবেক মেহনত জারি রাখা আবশ্যিক। পাশাপাশি চেষ্টা চলতে থাকবে যোগ্যতম ও সঠিক ব্যক্তি বা সংগঠনের পেছনে একত্রিত হয়ে যাওয়া, যদি পরিস্থিতির উপযুক্ততা উপস্থিত থাকে।

শায়খ আবু বকর লিখেন —

“আমাদের ইসলামী ইতিহাসের বড় অংশ জুড়ে এক শাসনব্যবস্থার পতন ও অন্য শাসনের উপান্বে যুগসন্দিক্ষণগুলোতে কিংবা বহিঃক্রমের মতো (যেমন তাতারি অভিযানের সময় কিংবা ত্রুসেড অভিযানের সময়—)

উম্মাহর ক্রান্তিলগ্নগুলোতে বিভিন্ন প্রশাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর মাঝে কোনো কোনোটি অনেকগুলো ক্ষুদ্র ইমারা/রাস্তাকে একীভূত করে শেষে একটি খিলাফাহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়। কোন কোনটি পার্শ্ববর্তী এক বা একাধিক রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয় কিংবা সরাসরি খিলাফাহ'র সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়।

এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ, যেমনটি শায়খ আল্লামা আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনি উল্লেখ করেছেন, ত্রুসেড

চলাকালীন, খেলাফাহশূন্য সময়গুলোর ব্যাপারে। শায়খ লিখেন—

“অধিকাংশ লেখক, যারা বিরতির (উম্মাহর খিলাফাহশূণ্য বা কর্তৃতশূণ্য) সময় ও যুগসন্ধিক্ষণগুলো নিয়ে লিখেছেন, তারা তার প্রতিকার বিধানে, কেবলমাত্র সে সকল ব্যক্তির অবদানকেই তুলে ধরেছেন, যারা নিজেদের পূর্বেকার বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন মেহনত, ভূমিকা ও বিচিত্র প্রয়াসকে একীভূত করে যুগান্তকারী কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

আমরা কোনো কোনো লেখককে দেখি, সকল অবদান একমাত্র নেতা নুরুল্লাহ জঙ্গীর বলে দাবি করেন, কিংবা কেবল সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বলে দাবি করেন ইত্যাদি।

এতে করে মানুষের মনে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাসের মহান অধ্যায়টি রচিত হয়েছে এমন একটি রাষ্ট্রশক্তির অধীনে, যা গোটা মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করে।

অথচ এমন ধারণা স্পষ্ট ভুল।

খেলাফতশূণ্য বা তামকীনশূণ্য এই সময়গুলোর ইতিহাস যে গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে, তার কাছে এটা স্পষ্ট যে, 'মুসলমানরা সে সময় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ছোট ছোট দলে, বিক্ষিপ্ত সংগঠনে বিভক্ত হয়ে তবেই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।' হয়তো কখনো কোনো দুর্গশহর (সিটাডেল) কোনো এক জামাত দখল করেছে, যার পতাকাতলে কিছু লোক জড়ে হয়েছে, তো তমুক গ্রাম অপর একজন আলেম নেতৃত্ব মেনে নিয়ে তার চারপাশে সমবেত হয়ে প্রতিরোধ করেছে। এদিকে কোনো একজন আলেম তার কিছু ছাত্রকে সংগঠিত করেছেন, যারা তাঁকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে, তো অন্য প্রাণে অপর কেউ এ কাজ করেছে। এভাবেই।

আমি মনে করি, যে গ্রন্থটি সবচেয়ে সুচারুর পে এই বাস্তবতা তুলে ধরেছে, তা হলো—“আল-ইতিবার”। এর রচয়িতা আমীর উসামা ইবনে মুনফিয়। তিনি "শিরায়" নামক দুর্গশহরের নেতা ছিলেন। তাঁর বংশ আলে মুনফিয় এই দুর্গশহর শাসন করেছে।

আমি অন্য একটি পর্যন্তে যাবার আগে যে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বলে যেতে চাই, তা হলো—নুরুল্লাহ জঙ্গী এবং সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রহঃ)-এর বংশধরদের মত বড় বড় নেতাদের ভূমিকা হলো: বিভিন্ন খণ্ড দল-উপদল ও সংগঠনের মাঝে সমন্বয় করে এক নেতৃত্বের অধীনে সেগুলোকে নিয়ে আসা। এসবের পরেও ক্রুসেড মোকাবেলায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছোটো ছোটো সে সকল দল-উপদলের বিরাট বিরাট স্বতন্ত্র অবদান অনন্বীক্ষ্য। এ সমস্ত ছোট ছোট দল ও সংগঠন, যেগুলো কোন কোন দুর্গ অধিকার করেছে, ছোট ছোট শহর দখলে নিয়েছে, একই সঙ্গে শক্ত শিবিরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও ত্রাসের সৃষ্টি করেছে, ক্রুসেড মোকাবেলায় এগুলোই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

পাঠক! আপনি চাইলে ক্রুসেডগুলোর ইতিহাস বিস্তারিত পড়ে দেখতে পারেন যে, ইলম ও তেহরিকের পথিকদলের দ্বারা যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেগুলোই শেষে বড় বড় সংঘাতগুলোতে বিজয় ছিলয়ে এনেছে।

বিজয়ের ক্ষেত্রে বড় বড় সে সকল সংঘাতের একক কোনো ভূমিকা ছিল না। বরং হিন্দিনের মতো বড় বড় যুদ্ধগুলো ছোট ছোট এমন অনেক যুদ্ধের ফসল ছিল, যেগুলো ইতিহাসে সেভাবে আসেনি। কিন্তু যুগান্তকারী একটি বিজয়ের জন্য এগুলোই ছিল প্রথম চাল।”

(শাইখ আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনি রচিত-“তلك আমা মুহাম্মদ সলি اللہ علیه وسالم ولن تموت” নামক প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত)

অতএব, আমরা বুঝতে পারলাম, ইসলামের সম্মান ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট প্রত্যেকটি জামাত, গোত্র, রাষ্ট্র, মতাদর্শ এই উম্মাতের এক একটি অংশ। সকলেরই দায়িত্ব হলো: শক্রদের প্রতিরোধ করা এবং ইসলামকে সমৃদ্ধ রাখা; যা এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি।

পাশাপাশি সকলেরই জন্য যোগ্য একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া কাম্য। অতএব, মুসলিম উম্মাহর সংকটাপন্থ অবস্থা দূরীকরণে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসৃত নীতি হচ্ছে:-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا حُذْوًا حِذْرَكْمٌ فَآنِفِرُوا تُبَاتٍ أَوْ آنِفِرُوا جَمِيعًا

"হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বেরিয়ে পড় অথবা একত্রে বের হও।"

বাস্তবতা এটাই যে, পশ্চিমা সভ্যতা নেতৃত্বাধীন ইসলামের প্রকাশ্য ও গোপন শক্রদের সাথে দলে লিপ্ত হতে গিয়ে যদি এই উম্মাহ অসংখ্য ব্যক্তি বা সংগঠনে বিভাজিত হয়ও; সঠিক সময়ে তাদের সবচেয়ে যোগ্যতম (আমানতদারিতা, পরহেজগারীতা ও বাস্তবতার মানদণ্ডে) ব্যক্তি বা দলের অধীনে বাকি সবার জন্মে যাওয়া এক অনিবার্য বাস্তবতা। যা ইতিহাস বার বার প্রত্যক্ষ করেছে, মুক্তি, আন্দালুস, আইনে জালুত, হিস্তিন ও সর্বশেষ কাবুলে! তাই, ইসলামপন্থীদের জন্য মূলত প্রয়োজন বিশুদ্ধ আকিদা ও মানহাজ গ্রহণ করে, মুমিনদের ছাড়প্রদান ও ইসলামের প্রতিপক্ষদের সর্বাত্মক উপায়ে নিরলস বিরোধিতার মাধ্যমে নিজেদের প্রচেষ্টাসমূহকে একমুখী রাখা।

আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে, জাতির উপর সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির আধিপত্য। আর সমাধান হচ্ছে, ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির আধিপত্যের পুনরুদ্ধার! তাই, এক্ষেত্রে আমাদের সকল বন্ধুত্ব, শক্রতা, বিতর্ক ও মেহনত যেন হয়, এ মহান ও কষ্টসাধ্য ফলাফল অর্জনের মুয়াফিক।

সুতরাং, হঠকারী নয়, এমন প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি তাই থাকতে হবে দরদ, মুহার্বাত ও সহর্মিতা! প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য বিতর্ক বা খন্ডন হবে অজ্ঞেষ্টিত, ইলম ও যুক্তিনির্ভর। আবেগ ও ইগোর বশবর্তী হয়ে আমরা কোনো মুসলিম ভাইকে বিগড়ে দিয়ে সেক্যুলার ও অন্যান্য ইসলামের শক্রদের পুতুলে পরিণত করব না। আন্তরিক ঈমানদারদের ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ অবস্থান হোক- "বৈরীতা নয়, ভাতৃত!"

সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে দীনি মেহনতের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক প্রদত্ত 'আল্লাহ আমাকে নিয়ে করেছেন মুসলিম হত্যা করতে' শীর্ষক বার্তায় উল্লেখিত কিছু কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ-

"মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা, তাদের হক নষ্ট করা, তাদের সম্পদ দখল করা, তাদের স্বাধীনতা খর্ব করা; কখনই ঐক্য সৃষ্টি ও অনৈক্য দূর করার কোনো মাধ্যম নয়। ঐক্য তো আসবে মুসলমানের সামনে বিনয়ী হওয়ার দ্বারা, তাদের খেদমত করা দ্বারা, তাদেরকে সম্মান করা দ্বারা, তাদের মাঝে আঙ্গ ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে।

কোন জামাতের অধীনস্থদের অন্য জামাতের অধীনে দ্বীনের কাজ করার স্বাধীনতা খর্ব করা বৈধ নয়। যতক্ষণ না মুসলমানরা একজন ব্যক্তিকে (নেতা হিসেবে) মান্য করতে একমত হয়।

কারণ দ্বীনি কাজসহ সমস্ত ইবাদাত পরম্পরের সন্তুষ্টির মাধ্যমে হয়, জোর জবরদস্তির মাধ্যমে নয়। আর মুমিনদের জন্য শর্ত পূরণ করা জরুরী।

তাই যে ব্যক্তি কোন দলের সাথে দ্বীনের কাজ করার বাইআত ও অঙ্গিকার করেছে সে তার অঙ্গিকার ভঙ্গ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার আমীরদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজের বিষয়ে দায়িত্বমুক্তি ও দলে না থাকার ঘোষণা না দিবে। আর আমিরদের

জন্য তার পথে বাঁধা হওয়া জায়ে নেই। তারপর সে যেখানে, যাদের সাথে কাজ করতে চায় সেক্ষেত্রেও বাঁধা দেয়া জায়ে নেই। জামাতবদ্ধ ইবাদাতের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়াই হলো মূলনীতি। তাই বান্দা যার সাথে চায়, যেখানে থেকে চায় – সেখানে থেকেই ইবাদাত করতে পারবে। এক্ষেত্রে কোন দোষ নেই। এই ইসলামি মূলনীতির মাধ্যমে ইসলামের কাজগুলো সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়।"

এছাড়া, ইমাম উসামা আবু আবদুল্লাহ রহিমান্দ্বল্লাহ বলেন,

"আমি মনে করি- (আন্দোলনের) এই অভ্যন্তরীণ সফলতা ও অগ্রগামিতার পেছনে একটি বড় কারণ এই যে, (আমাদের তানজিম) সবসময় অন্যান্য তানজীম ও জামা ‘আহর সাথে সু-সম্পর্ক ও সমরোতা বজায় রেখে চলে। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাওফীকের পর বলবো- আমার এই অতি ক্ষুদ্র বয়সে দেখেছি, সর্বদা আমাদের আগ্রহ ছিল আমাদের সকল মেহনত এবং শ্রম যেন আল্লাহর দুশ্মনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়। কোনো মুমিনকে, ইসলামী কোন দলকে আমরা কখনোই প্রতিপক্ষ বানাবো না।"

মুসলিম ভাইদের সাথে কখনোই তর্কে জড়াবো না। তাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করবো না। ইসলামী সব দলের সাথে আমাদের থাকবে সমরোতা, সহমর্মিতা; নিয়তের বিশুদ্ধতা।"

وَ قُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُكُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُبَيِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"আর বলুন, ‘তোমরা কাজ করতে থাক; আল্লাহ তো তোমাদের কাজকর্ম দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও।

আর অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গায়ের ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।"

তাই ইসলামের প্রধানতম প্রতিপক্ষ সেকুলার আধিপত্যের অবসানকে সামনে রেখে ঐক্যের সূত্র হচ্ছে- প্রত্যেক তাওহিদবাদী মুসলিম (চাই কিছু পাপ ও বিদআতে লিঙ্গ) ব্যাকি বা দল যদি সেকুলার শাসনব্যবস্থা, আধিপত্য ও সংস্কৃতির পতনে সম্মত হয়, ইসলামের কর্তৃত্বের দাবীতে আন্তরিক হয় তবে,

১) তাদেরকে এই সেকুলার শাসনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির বিরোধিতায় লেগে থাকতে হবে। সকল সামর্থ্য ও সংকল্পকে পুঁজি করে। কেননা, শায়খ নাদভি রহ. চমৎকারভাবে স্পষ্ট করেছেন, 'মানবীয় ফিতরাতেই এটা রয়েছে যে, কেবল শক্রতার মাধ্যমেই ঐক্য অর্জন করা যায়। যার ফলে সকল জাতিগোষ্ঠীই কওমকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে শক্র সন্ধান করে থাকে। হোক তা কাল্পনিক বা বায়বীয়।'

আর,

২) নিজেদের পারস্পরিক সমালোচনা ও ইসলাহের স্থানে সন্তান্য কোমলতা ও কৌশল গ্রহণ করতে হবে। চাই তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে। মুমিনদের মধ্যকার মতপার্থক্যকে বিবাদে পরিণত করা থেকে বেচে থাকতে হবে। ভুলকে ভুল বলা বা প্রয়োজনীয় ইলমি সমালোচনা তো হবেই, তা কাম্যও বটে। বিপরীতে, প্রতিপক্ষকে উত্তেজিত করা, বিগড়ে দেয়া এবং শক্র পুতুলে পরিণত করার আভ্যন্তরীন প্রবণতা পরিত্যাগ করতে হবে।

ইসলাম ও আহলে হক কোনো জনপদে শক্তিশালী এমন অবস্থায় ফিকহ একরকম; আর ইসলাম ও আহলে হক দুর্বল ও সংশয়গ্রস্ত, এমন অবস্থায় ফিকহ আরেক রকম। ঢালাও চিন্তা ও মানসিকতা থেকে আমাদের দূরে থাকা আজ অপরিহার্য!! কেননা, তা সহযোগী কমায়, শক্র বাড়ায়।

খাইরে উম্মাহকে দেয়া সাক্ষাৎকারে, এক প্রশ্নের উত্তরে, শায়খ উমার মাহমুদ উসমানের (شیخ ابو قتادہ فلسطینی) কথার সারমর্ম হলো,

"সেকুলার শাসকের অপসারণের ব্যাপারে যদি মানুষ একমত হয়; তবে, তা রিদার বিরুদ্ধে হবে, না জুলুম বা বিদ্রোহের বিরুদ্ধে হবে- তা নিয়ে যদি ইখতিলাফ/মতপার্থক্য হয়, তবে সেটা আপাতত বড় কোনো সমস্যা নয়।

যেমন, আহমাদ শাহ মাসউদের বিরুদ্ধে আহলে আরবরা অবস্থান নিয়েছিলেন 'রিদাহর বিরুদ্ধে' মনে করে। আবার, ইমারাতে ইসলামিয়ার এক্ষেত্রে অবস্থান ছিল যে, এই অভিযান "বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে"।

এমতাবস্থায়, সেকুলার শাসকের বিরুদ্ধে সামরিক ও সামগ্রিক অবস্থানের কারণ নিয়ে ইখতিলাফ করে আমাদের একে অপরের বিরুদ্ধাচারণ করা উচিত নয়। এবং একে অপরের ভুল ধরে তুচ্ছতাছিল্য বা অবজ্ঞা করা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, এ ধরনের ইখতিলাফ আহলে ইলমের মাঝে সেই প্রাথমিক যুগ থেকেই বিদ্যমান ছিল।

আমাদের উচিত এই ইখতেলাফকে সহজভাবে গ্রহণ করে মূল কাজ (তথা, সেকুলার শাসকের অপসারণের মাধ্যমে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করা) সম্পন্ন করা। যেহেতু কাজটির ব্যাপারে কারো মাঝে ইখতিলাফ নেই।"

যদি ইসলামী সংগঠনগুলো ও নেতৃত্ব শাসনব্যাবস্থার কুফরের ব্যাপারে একমত হয় এবং সুস্পষ্ট ভাস্ত আকিদার না হয়; তবে, শাসকদের তাকফীর করার বিষয়টি নিয়ে উন্নেজনা তৈরির পরিবর্তে, আমাদের দলিলভিত্তিক মত জনসাধারণের কাছে উপস্থাপন করাই কাম্য। বরং, যে বা যারাই ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠায় দাওয়াহ, লেখালেখি, ওয়াজ এবং মিডিয়া, সামরিক বা সাংগঠনিক পদক্ষেপের মতো নানাবিধ প্রক্রিয়ায় সেকুলার শাসনের অপসারণ চান, তারাই এখানে উদ্দিষ্ট। তবে, ইরজা, অন্যায় তাকফির ও অন্যান্য ভাস্ত চিন্তাধারা প্রতিহতকরণে বাস্তবসম্মত মেহনত জারি রাখাও, অগ্রগামী আন্দোলনের অপরিহার্য দায়িত্ব বটে।

শায়খ আবু কাতাদা আল ফিলিস্তিনি বলেন,

কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের উপর আবশ্যক হলো দীনের সংক্ষার করা এবং তার সজিবতা ও উজ্জল্য প্রথম রূপে ফিরিয়ে আনা। একারণে আমাদের উপর আবশ্যক হলো, শাখা-প্রশাখা নিয়ে ধোঁকায় না পড়া। বরং আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, দীনের উসূল বা মূলনীতি কী এবং এই শাখা ও অংশগুলো পর্যন্ত আসার ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি কি?

কোনো গোষ্ঠী কোনো মাসআলায় আমাদের সহমতাবলম্বী হওয়ার অর্থ আদৌ এটা নয় যে, এই জামাত আমাদের দলভুক্ত এবং আমরা তাদের দলভুক্ত, আমাদের যে অধিকার আছে, তাদেরও সেই অধিকার আছে এবং আমাদের উপর যে দায়িত্ব আরোপিত হবে, তাদের উপরও সে দায়িত্ব আরোপিত হবে। বরং তা হবে উক্ত দলের মানহাজ এবং তাদের আল্লাহর দ্বীন বোবার পদ্ধতি দেখে।

আমাদের উম্মাহর এমন অনেক পর্যায় অতিবাহিত হয়েছে, যখন জিহাদ ও যুদ্ধের নেতৃত্বের মাঝে অনেক কঠিন কঠিন বিদআতি বিষয় ছিল। রিজালের কিতাবসমূহ তাদের প্রশংসা করেছে এবং তাদের উত্তম স্মৃতিগুলো এখানে মানুষের মুখ ও ঠোঁটে জীবন্ত হয়ে আছে। কিন্তু আমাদেরকে তাদের বিদআতি দিকটি এবং তা থেকে সম্পর্কমুক্ত হওয়া এবং (উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সময়ে) তার বিরোধিতা করা থেকেও দৃষ্টিনত করে ফেললে চলবে না। যেন আমরা প্রকৃত বিষয়টির অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারি এবং এগোষ্ঠীর প্রশংসা ও সমর্থনের উষ্ণতায় হারিয়ে না ফেলি।

তাই, ইসলামপন্থীদের সকলকেই সেকুলার আধিপত্য ও চক্রান্ত প্রতিরোধ ও দূরীকরণে মূল মেহনত দেয়া উচিত। এবং আহলে ইসলামের আন্তরিক ব্যক্তি ও দলসমূহকে (চাই তাদের ভুলঝুটি থাকুক) অন্যায় আক্রমণ পরিহার করে, সহনীয় ইখতিলাফগুলোকে পাশে রেখে অগ্রসর হওয়া জায়গা খোজা উচিত।

পরিশেষে বলা যায়, সঠিক দাওয়াহ ও মানহাজকে সংগঠিত মেহনতের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়াকে সাম্প্রদায়িকতা আখ্যায়িত করা থেকে যেমন বিরত থাকা উচিৎ, একইভাবে সাংগঠনিক মেহনত করতে গিয়ে সংগঠনকে গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতায় রূপ দেয়াও ইসলামপন্থীদের জন্য পরিত্যাজ্য একটি বিষয়। আদর্শ, চিন্তা, অভিভূতি ও মেজাজের স্বাভাবিক মতপার্থক্যকে দলাদলি বা বিচ্ছিন্নতার ট্যাগ লাগানোর মতো নিচু মানসিকতা যেমন কাম্য নয়, একইভাবে সুযোগ ও সন্তান থাকা সত্ত্বেও বৃহত্তর প্ল্যাটফর্মে একীভূত হওয়া থেকে অকারণে বা হঠকারীতাবশত দূরে থাকাও সুন্দর মানসিকতা নয়।

বরং, কাম্য হলো প্রত্যেক ব্যাক্তি, জামাত বা প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ জায়গা থেকে সমাজের উপর চেপে বসা কুফর ও মুনকারের অপসারণ এবং তাওহিদের কর্তৃপ্রতিষ্ঠার পথে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করে যাবে; অন্যান্য মুসলিম ব্যাক্তি ও সংগঠনগুলোর সাথে পরামর্শ, সমন্বয় ও সহযোগিতা জারি রাখবে এবং উপযুক্ত পরিস্থিতি ও সময়ে ইসলামের সাফল্য ও বিজয়ের স্বার্থে একক প্ল্যাটফর্মে স্বকীয়তা ও কল্যাণ বজায় রেখে এক্যবন্ধ হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

আল্লাহ তা আলা বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءِ بَعْضٍ إِلَّا تَعَلَّمُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كِبِيرٌ

"আর যারা কুফরী করেছে তারা পরম্পরার পরম্পরার অভিভাবক, যদি তোমরা তা না কর তবে যদীনে ফিতনা ও মহাবিপর্য দেখা দেবে।"

আল্লাহ তা আলাই ভালো জানেন।